দৈনিক বাংলা

অনেক স্কুলেই ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশি

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

ঢাকার কোতওয়ালী থানার আই-ইটি গার্লস প্রাইমারী স্কুল। ৭৫ সালের আগে পর্যন্ত স্কুলটি চলতো একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর যখন স্কুলের জমির দলিল পত্র চাওয়া হলো, তখনি ঘটলো ঝামেলা পত্র চাওয়া হলো তখনি ঘটলো ঝামেলা। স্কুলের বাড়ি জমির মালিক তালা বন্ধ করে উঠিয়ে দিলেন স্কুল। শেষটায় ডিআই অফিস একমাস স্কুল বন্ধ থাকার পর এর সাময়িকভাবে চলার ব্যবস্থা করে দিলেন পাশেরই আরেকটি স্কুলে। সেই থেকে স্কুলটি এখনো এই মহল্লা উন্নয়ন সোসাইটি প্রাইমারী স্কুলেই বসছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর স্কুলটির লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে সেটি তার নিজস্ব জায়গাটুকুও হারিয়েছে। স্কুলটির অবস্থা যেন ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। আর শিক্ষকদের অবস্থা? মাকখানে থেকে তারা ৭৫ সালের অক্টোবর মাসের বেতন খুইয়েছেন। কি অপরাধে তারা এই বেতন পেলেন না, তার কোন কারণও তারা আজ পর্যন্ত জানেন না। আর এই বেতন আদৌ পাওয়া যাবে কীনা তাও তারা জানে না।

সুরিটোলা প্রাইমারী স্কুল। খাতায় কলমে ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুশো। অথচ ছাত্রদের দৈনিক হাজিরা পঞ্চাশের বেশি নয়। এই স্কুলেই কাজ করেন আটজন শিক্ষক। বংশাল নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্রদের দৈনিক হাজিরা তিরিশের বেশি নয়। অথচ খাতায় কলমে ছাত্রসংখ্যা দুশোর কম নয়। ওখানে শিক্ষকতা করেন ছজন শিক্ষক। মিরনজুলা প্রাইমারী স্কুল। ছাত্র সংখ্যা খাতায় কলমে প্রায় সত্তর। অথচ দৈনিক হাজিরা দশ থেকে বারো জনের বেশি নয়। কাজ করেন তিনজন শিক্ষক। স্কুলটি বসে বেলা ১২টায়। চলে তিনটা পর্যন্ত। স্কুলটি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে ওখানে স্কুলের বারান্দায় দিনের বেলাতেই বসে মদের আড্ডা। রাতে চলে অসামাজিক কার্যকলাপ।

এসব স্কুলে ছাত্র নেই। অথচ রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক। শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই—অথচ এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নেই কোন উদ্যোগ।

একজন শিক্ষক। তিনি কাজ করেন বংশাল নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল কমিটির নিয়োগপত্র নিয়ে তিনি কাজ করছেন ৭৩ সাল থেকে। স্কুলটি সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর থেকে প্রতি মাসেই মাস কাবারি বিলে যাচ্ছে তার নাম, তার কাজের বিবরণ। কিন্তু আজ পাঁচ বছর পরও কেন তার বেতন হচ্ছে না বা ডিআই অফিসের অনুমোদন আসছে না তা তিনি জানেন না। অথচ রীতিমত তিনি স্কুলে কাজ করে যাচ্ছেন বিনা মাইনেতেই। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ডিআই অফিসের তাকে নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই।

তিনজন শিক্ষিকা ও একজন শিক্ষক। রাজার দেউড়ি গার্লস প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মাসুদা খাতুন। আর্মানীটোলা গার্লস প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হায়াতুন্নেছা। ফজলুল করিম গার্লস প্রাইমারী স্কুলের সুরাইয়া খানম এবং গোয়ালনগর প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহেব আলী ভূঁইয়া। স্কুল প্রাঙ্গণে কোনদিন আর দেখা যাবে না তাদের মুখ। তারা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন। অথচ আজো তাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে পায়নি তাদের পরিবার পরিজন। ওগুলো আটকে আছে লাল ফিতার বাঁধনে। কবে ফিতার গেরো খুলবে তার ঠিক নেই।

রাজার দেউড়ি প্রাথমিক (বালক/বালিকা) বিদ্যালয়। এর লাইব্রেরী কক্ষটি বর্তমানে স্কুলের বেহাত হয়ে গেছে। ওখানে চলছে একটি ভিন্ন অফিস। আর্মানীটোলা প্রাইমারী স্কুলের কিছু অংশ বর্তমানে দেয়ালবন্দী এবং পরিণত হয়েছে স্কুলেরই একজন শিক্ষয়িত্রীর বাসায়। স্কুলের এসব জমি কে হস্তান্তর

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন ॥ শেষ ॥

করেছে, কিভাবে তারা দখল করেছেন তার কোন হদিস নেই। সংশ্লিষ্ট দফতরও তেমন খোঁজ খবর রাখেন না।

টুকরো টুকরো এসব ঘটনা থেকে একটি ব্যাপারই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের প্রশাসন ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে। রয়েছে অব্যবস্থা ও গাফিলতি। রয়েছে শিক্ষাঙ্গনগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের এমনি ধরনের অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তার সাথে আলাপ হলে তিনি জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারী আওতাধীনে নেবার পর প্রায় ৩৬ হাজার স্কুলের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। অথচ বাড়েনি আমাদের কর্মীর সংখ্যা। ডিপিআই অফিসে ৪৭ সালে কেরানীর সংখ্যা ছিল ৬ এখন ৭৭ সালেও আমাদের ৬ জন কেরানীই রয়েছেন। অথচ কাজের চাপ বেড়েছে কয়েকগুণ। আগে ছিলেন দুজন অফিসার, এখনও তাই।

মুষ্টিমেয় এ ক'জন কর্মী নিয়েই দেখতে হয় আমাদের প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক ১৯ জন ডিআই, ৩৮ জন ডিইও সাড়ে চারশ থানা শিক্ষা অফিসার, সাড়ে চারশ এএসআই এবং প্রায় সাড়ে আটশ কেরানীর কাজকর্ম। এতে স্বভাবতই আমরা ইচ্ছে সত্ত্বেও সব কাজ ঠিক সময়ে ঠিকভাবে করতে পারি না।

তিনি স্বীকার করেছেন, এই কর্মী সমস্যার যতদিন সমাধান না হবে ততদিন সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা সম্ভব নয়।

শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো জানিয়েছেন যে একজন থানা শিক্ষা অফিসারকে স্কুল পরিদর্শন, শিক্ষকদের বিলের ব্যবস্থা ও জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কাজকর্ম ছাড়াও করতে হয় আরো বিভিন্ন কিছু। রিলিফের মালামাল বিতরণ থেকে শুরু করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যন্ত বহু কাজই তাকে থানায় করতে হয়। সহায়তা করতে হয় সিও (ডেভ)কে। ফলতঃ অনেক সময় অনেক থানায় এমন অবস্থা হয় যে এসব কাজ করতে গিয়ে তার আসল কাজই চাপা পড়ে যায়। ঘোরা হয় না স্কুল। দেখতে পারেন না ছাত্র ও শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধা।

তিনি স্বীকার করেছেন যে এদেশের স্কুলগুলোতে প্রশাসনিক চাপ অব্যাহত রাখা যাচ্ছে না।

বিভিন্ন ডিআই অফিসেও কর্মীর এই সংখ্যাল্পতার জন্য সরকারী আওতাধীনে প্রাথমিক স্কুলগুলো চলে যাবার পর আজো শিক্ষকগণ কোন নিয়োগপত্র পাননি। এমনকি যে সরকারী নির্দেশে তারা চাকরিতে বহাল রয়েছেন তার কোন কপিও তারা পাননি। তাদের সম্বল থানা শিক্ষা অফিসারের কাছেও ডিআই অফিসের ফাইলে রক্ষিত দুটো পৃথক কপি।

শিক্ষকদের জন্য অফিসে কর্মীর এই সংখ্যাল্পতার জন্য আজো তৈরি হয়নি কোন পার্সন্যাল ফাইল। সার্ভিস বুকের মধ্যেই তাদের সব-কিছু এখনো সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন স্কুলের জন্যও নির্দিষ্ট কোন ফাইল নেই। আর পুরনো ফাইল বা রেকর্ড পত্র তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। এলোমেলোভাবে এই রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ডিআই অফিসগুলো হয়ে উঠেছে মুদির দোকানের শামিল।

এর সাথে রয়েছে প্রশাসনিক সুষ্ঠু নীতির অভাব। উদাহরণস্বরূপ এখানে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত কিছু স্কুলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দেশে এখনো প্রায় ১০ হাজার বেসরকারী স্কুল চালু রয়েছে। এসব স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। রয়েছেন অনেক কার্যরত শিক্ষক। তাদের অনেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। নিয়ম-অনুযায়ী এসব স্কুলকে সরকারী আওতায় আনতে হলে শিক্ষকসহ নিতে হবে। তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? অবস্থাটা হয় এই যে দু'তিন বছর চাকরি করে বা না করেই অনেকে সরকারী শিক্ষক হচ্ছেন অথচ যারা ট্রেনিং নিয়ে বসে আছেন প্যানেলভুক্ত হয়ে তাদের চাকরি দেয়া যায় না। ফলে বাড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার শিক্ষকের সংখ্যা। দ্বিতীয়ত স্কুলে বাড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন শিক্ষকদের সংখ্যা। ফলে কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ট্রেন্ড টিচিং পদ্ধতির প্রয়োগ। অথচ এজন্য সরকারী কোন সুষ্ঠু নীতি নেই।

আর এমনি একটি বেসরকারী স্কুল যদি উন্নয়ন কর্মসূচীতে পড়ে এবং ৪৫ হাজার টাকা পায় তবে অবস্থাটা কি হয়? ফলটা হয় এই যে ৪৫ হাজার টাকা খরচের পরও সরকারকে নিতে হয় বাড়তি কিছু শিক্ষক (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন)। দিতে হয় মাসে মাসে বেতন। করতে হয় তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। অথচ এদিকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বসে আছেন তাদের এসব স্কুলে কোন নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বর্তমান পদ্ধতির জন্য।

প্রাইমারী (বেসরকারী) স্কুলগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার এ পদ্ধতি বা নিয়ম চালু থাকলে আশংকা করার কারণ রয়েছে যে এতে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে বিশ বছরেও নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা যাবে না। শুধু তাই নয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার শিক্ষকদেরও এ ব্যবস্থায় চাকরি দেয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু একটি নীতি প্রণয়ন।

শিক্ষাঙ্গনের এসব অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা দূরীকরণের জন্যই তাই প্রয়োজন প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন।